দৈনিক খবর
তারিখ 09 NOV 1993
পৃষ্ঠা... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

ছাত্র রাজনীতি ও সন্ত্রাসবাদ

● ডাঃ এস এ মালেক ●

তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে জাতীয় রাজনীতির সাথে ছাত্র সমাজ সংশ্লিষ্ট হয়েছে বেশ কয়েক যুগ পূর্ব থেকে। সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদ যখন তার স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্নে ঐ সব দেশে জনগণের ইচ্ছা এবং স্বার্থের বিরুদ্ধে স্বৈরশাসকদের সমর্থন করত তখন ছাত্র সমাজ তা প্রতিরোধ করতে প্রতিবাদমুখী হয়। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কবলে পড়ে ঐ সব দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সব সংকট সৃষ্টি হয়েছিল জাগ্রত বিবেকবান ছাত্র সমাজ তার বিরুদ্ধেও আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়।

বাংলাদেশে ধর্মের নামে পাকিস্তান যে শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিলো তার বিরুদ্ধে পঞ্চাশ দশকেই ছাত্র সমাজ প্রতিবাদমুখর ছিল। তাদের ওপর যখন আঘাত এল তখন রক্ত দিয়ে তারা তা প্রতিরোধ করে। তখন ছাত্র সমাজ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজনৈতিক দলের সম্পূরক হিসেবে কাজ করত। তারা সক্রিয়ভাবে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে সংশ্লিষ্ট ছিল না। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে তাদের টেনে আনা হয় ষাট দশকে। আইয়ুব–মোনায়েম স্বৈরাচারী চক্র যখন এ দেশে জনসমর্থন সংগ্রহে ব্যর্থ হয় তখন ছাত্র সমাজের একাংশকে প্রলোভন দিয়ে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে শিক্ষাঙ্গনে প্রভাব সৃষ্টির নেশায় মেতে ওঠে। তখন থেকেই প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র সমাজের একাংশ সরকারী রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ল এবং ঠিক তার বিপরীতে প্রায় গোটা ছাত্র সমাজ বিরোধী দলের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সরকারী ছাত্র সংগঠন এনএসএফ–ই প্রথম আইয়ুব–মোনায়েম আমলে এ দেশে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হয়।

এতদসত্ত্বেও ছাত্র সমাজের সক্রিয় সমর্থনে এ দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অগ্রসর হতে থাকে। '৬২–এর শিক্ষা কমিশন আন্দোলন, '৬৬–এর ছয় দফা আন্দোলন ও '৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১–এর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবার কারণে এ দেশে ছাত্র সমাজ প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে আমাদের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ছাত্র নেতৃবৃন্দ প্রায় সমান্তরালভাবে জাতীয় নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি কাজ করায় জাতীয় রাজনীতিতে তাদের একটা প্রত্যক্ষ অবস্থান তারা সৃষ্টি করে নেয়। পরবর্তীতেও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

একমাত্র এনএসএফ ছাড়া আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ, কোন দলীয় বা গোষ্ঠীগত সংকীর্ণ স্বার্থ নয়। স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্র সমাজ জাতীয় রাজনীতিতে এই ধারা রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি, তারা দলীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবার কারণে ছাত্র সমাজের একাংশ যেমন চেয়েছিল দেশের পুনর্গঠন কাজে আত্মনিয়োগ করতে, ঠিক তার বিপরীতে এক অংশ চেয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের ফসল নিজেদের ঘরে তুলতে। আর সরকারী দলের সমর্থনেই তারা এটা করতে চেয়েছে বার বার। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও র‍্যাডিক্যাল বলে দাবীদার ছাত্রদের একাংশ সশস্ত্র হওয়ার কারণে শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে তা ছিল ছাত্র সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী তৎপরতা। বেশ কিছুটা আবেগপ্রবণ ও উচ্চাভিলাষী ছাত্র সমাজের একাংশ তখন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েম করবার লক্ষ্যে সশস্ত্র তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের প্রচেষ্টাকে বেশ কিছুটা ব্যাহত করতে সক্ষম হয়।

'৭৫–এর ১৫ই আগস্টের নৃশংস হত্যাকান্ডের পর স্বৈরশাসকরা ঠিক আইয়ুব–মোনায়েমের মতোই ছাত্র সমাজের বিশেষ একাংশকে সরকারী দলে ভিড়িয়ে, তাদের দ্বারা ছাত্র সংগঠন করে, তাদের হাতে অস্ত্র ও অর্থ তুলে দিয়ে গণতান্ত্রিক ছাত্র সমাজ এবং রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের ওপর সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে নির্যাতন চালায় ও স্বয়ং স্বৈরশাসক জিয়াও ছাত্র সমাজের একাংশকে সাথে নিয়ে প্রমোদ বিহারে গমন করেন।

জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পার্লামেন্টে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে, মন্ত্রিসভার সদস্য বানিয়ে সুযোগ–সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে স্বৈরশাসনের ভিতকে মজবুত করার যে প্রক্রিয়া বিদ্যমান ছিল তাই প্রধানতঃ ছাত্র সমাজকে উচ্ছৃংখল ও উচ্চাভিলাষী করে তোলে এবং তারাই ছাত্রদের হাতে অস্ত্র ও অর্থ তুলে দিয়ে, তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতায় শরীক করে তাদের সন্ত্রাসবাদের দিকে ঠেলে দেন।

সেই ষাট দশক হতেই বিরোধী ছাত্র সংগঠনসমূহকেও সরকারী দলের নির্যাতনের মুখে টিকে থাকবার প্রয়োজনে বিরোধী দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়তে হয় ও প্রতিরক্ষামূলক কারণে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিতে হয়। স্বৈরশাসকরা ছাত্রদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যাওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে একটা বিশেষ বাহিনী কর্তৃক ছাত্রদের রিক্রুট করার ও তাদের পরামর্শ মতো সন্ত্রাস চালিয়ে যাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। ঐ বিশেষ বাহিনী কর্তৃক ছাত্রদের নিয়মিত উৎকোচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ বাহিনীর লোকেরা এভাবে সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছে।

এভাবেই ছাত্র সমাজের একাংশকে স্বৈরশাসকরা নিজেদের স্বার্থে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় লিপ্ত হতে উৎসাহিত করে ও সক্রিয় সমর্থন যোগায়। শিক্ষাঙ্গনসমূহে আজ যে সন্ত্রাসবাদ পরিলক্ষিত হচ্ছে তা অতীতের ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়

এর সাথে নতুন করে যুক্ত হয়েছে মৌলবাদী রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠনসমূহের সন্ত্রাসবাদ। মৌলবাদী জামায়াত–শিবির চক্রের ক্রিয়াকলাপ দেখে মনে হয় যে, তারা যতটা না গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে চায় তারচেয়ে অনেক বেশী আগ্রহী সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে। এ ব্যাপারে তারা দেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহকে বেছে নিয়েছে। এই হচ্ছে এ দেশে বর্তমান ছাত্র সমাজের সন্ত্রাসবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে যে, প্রায় প্রত্যেকটি দলের অংগ সংগঠন ছাত্র সমাজের ভেতর এখন এটা বিদ্যমান এবং তাদের অধিকাংশই দলীয় সন্ত্রাসবাদের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

শিক্ষাঙ্গন আজ যুদ্ধক্ষেত্র। অগণিত প্রাণ শিক্ষাঙ্গনে বিসর্জিত হয়েছে বা হচ্ছে। রগ কাটা, ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ করা, ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা, একদল কর্তৃক আর একদলকে ছাত্রাবাস ও শিক্ষাঙ্গন থেকে বহিষ্কার করবার প্রক্রিয়া প্রায় প্রতিদিন সংঘটিত হচ্ছে। এমনকি শিক্ষকরাও এসব সন্ত্রাসী তৎপরতার সাথে জড়িয়ে পড়েছেন এবং ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছেন। শিক্ষাঙ্গনে কোন নিরাপত্তা নেই। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের শিক্ষাঙ্গনে পাঠান উচ্চ শিক্ষার জন্যে আর তারা লাশ হয়ে ফিরে আসছে এই সন্ত্রাসবাদের কারণে। এ দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গেই পড়েছে। দলীয় রাজনীতির সাথে ছাত্ররা এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, দলবাজি ছাড়া তারা আর কিছুই করবার চিন্তা করছে না। নিরীহ ছাত্ররা যারা শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি চর্চার বিরুদ্ধে, তারাও রেহাই পাচ্ছে না সন্ত্রাসী রাজনীতির কবল হতে।

ছাত্র, অভিভাবক, রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, সাধারণ মানুষ সকলেই আজ উদ্বিগ্ন শিক্ষাঙ্গনের এই দুরবস্থার জন্যে। তারা সকলেই চিন্তা–ভাবনা করছেন কি করে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। দেশের সংবাদপত্রগুলো বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীরা এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তাদের কলম চালাচ্ছেন। অনেকে ইতিপূর্বেই অনেক পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। রাজনীতিবিদরা কিন্তু এখনও কোন সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা প্রকাশ করেননি।

বিশেষ করে সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির সন্ত্রাসী তৎপরতার সাথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, সন্ত্রাসবাদ ছাড়া তাদের দলীয় রাজনীতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে কি–না সে ব্যাপারে তারা সন্দিহান হয়ে পড়েছে।

সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতাসীন হয়ে ক্ষমতাসীন দল সন্ত্রাসবাদীদের ওপর এমনি রাজনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে, তারা তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না বরং তাদের দ্বারাই সরকার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে ক্ষমতাসীনদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা। সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাস আজ শুধু শিক্ষাঙ্গনকেই বিপর্যস্ত করেনি, প্রশাসন ও সামাজিক অঙ্গনেও মহাসংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের সন্ত্রাসের প্রতি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সমর্থন থাকায় তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে যা খুশী তাই করে চলেছে; সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিত্বও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের এই সন্ত্রাসে ইন্ধন যোগাচ্ছেন।

ছাত্র শিবির সন্ত্রাসকে একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বলেই বোধহয় ধরে নিয়েছে। আদর্শিক কারণে তারা সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক কারণে নরহত্যা করে আল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে বলে যে কথা বলা হচ্ছে তা চরম ফ্যাসিবাদী তৎপরতা বলেই মনে হয়। রাজনৈতিক কারণে মানুষ হত্যা করে ধর্মীয় কারণে বলে চালিয়ে দেয়ার ফ্যাসিবাদী কৌশল জামায়াত–শিবির চক্র অহরহ অনুসরণ করে চলেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন দল ও মৌলবাদী চক্র সম্মিলিতভাবে যেন্ত সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ প্রায় যুগপৎ বলেই মনে হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা একে অপরের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

ঠিক এরূপ একটা পরিবেশে ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করা সহজসাধ্য নয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সন্ত্রাসের অবসান দুঃসাধ্য বলেই মনে হয়। কেননা, সন্ত্রাসীরা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে সন্ত্রাস করে না। যতদিন ছাত্র সংগঠনসমূহ রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে কাজ করবে, ততদিন দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে ছাত্র সংগঠনসমূহকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। দল যদি সন্ত্রাসবাদকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে ও তার অঙ্গ সংগঠনকে সন্ত্রাসবাদমুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেয়, তবে অঙ্গ সংগঠন থেকে প্রতিবাদ আসবে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সন্ত্রাসীদের কারণে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। আর প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সন্ত্রাসীদের নিয়ামক হচ্ছে ঐ দলের কর্মকর্তারা। আসলে এককভাবে একটা দলের পক্ষে সন্ত্রাস পরিহার করা সত্য সত্যই বিপদজনক। আর সম্মিলিতভাবে সকল দলের পক্ষে সন্ত্রাস পরিহার করবার সিদ্ধান্তে পৌছাবার মতো রাজনৈতিক পরিবেশ এ দেশে বর্তমানে বিদ্যমান নেই।

সরকারী দলের প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও বিরোধী দলের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ছাড়া এরূপ ঐকমত্যে পৌছান সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি। জাতীয় পর্যায়ে ঐকমত্যে পৌছান ছাড়া এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব নয়। অথচ বাস্তব অবস্থা হচ্ছে সরকারী দল বিরোধী দলকে শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীই মনে করে না, দেশের শত্রু বলে প্রকাশ্য জনসভায় প্রায়ই অভিহিত করে থাকে, রাজনীতি দ্বারা নয়, সন্ত্রাস দিয়েই সরকার বিরোধী দলকে মোকাবেলা করতে আগ্রহী বলে মনে হয়। দলীয় সন্ত্রাসীদের দিয়ে বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন চালান ও তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটিয়েছে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক রীতি–নীতি অনুযায়ী সরকার ও বিরোধী দলের ভেতর সর্বনিম্ন পর্যায়ের যে সমঝোতা বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয় তাও ক্ষমতাসীন দল রাখতে রাজী আছেন বলে মনে হয় না। তা না হলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী থেকে মন্ত্রিসভার সদস্য পর্যন্ত যে ভাষায় বিরোধী দলের সমালোচনা করেন তাকে আর যাই হোক গণতন্ত্রসম্মত বলে অভিহিত করা যায় না।

তাছাড়া ক্ষমতাসীন দল যদি তার ছাত্র সংগঠনের হাতে অস্ত্র ও অর্থ তুলে দেয় এবং প্রশাসনকে তাদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব পালন করতে বলে তবে সন্ত্রাস দমন সম্ভব হবে কি করে? সত্যিকার অর্থে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হলে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই তার সশস্ত্র ক্যাডারকে পরিত্যাগ করতে হবে। অস্ত্রধারী, সে যেই হোক, সে কোন দলের রাজনৈতিক কর্মী হতে পারে না– এ কথা সততা ও সাহসের সাথে দলীয় নেতাদের ঘোষণা করতে হবে। সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।